ইকবাল কবীর মোহন

সাহাবীদের গল্প শোন

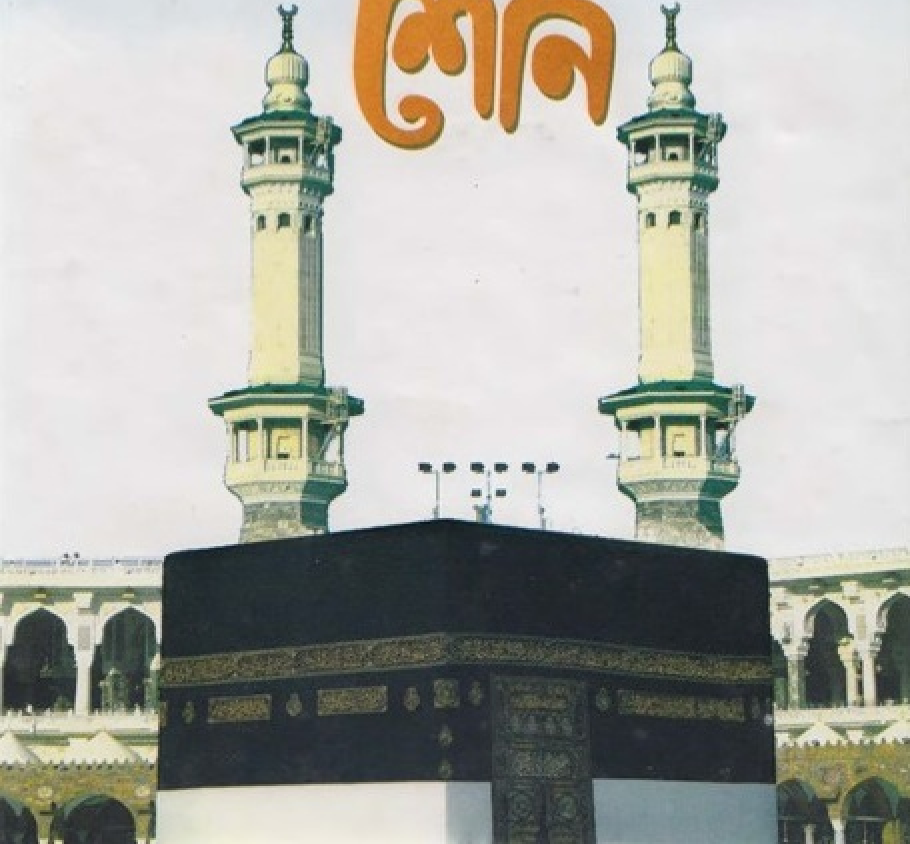

সাহাবীদের গল্প শোন

ইকবাল কবীর মোহন

www.amarboi.org

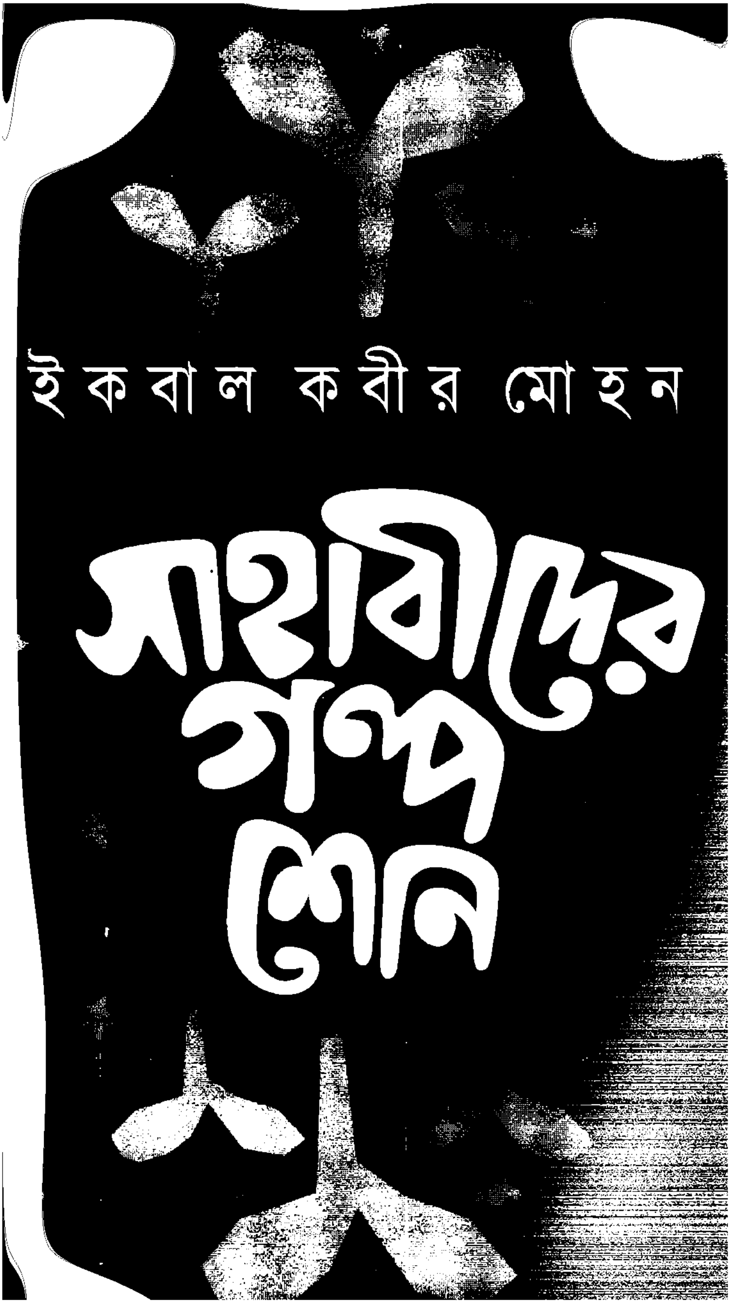

www.amarboi.org

সাহাবীদের গল্প শোন

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায় : নার্গিস মুনিরা, শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭১০-৩৩০৪৩০
প্রকাশ কাল : জানুয়ারি ২০১৩
শব্দবিন্যাস : ডিজাইন বাজার
ফোন : ৭১৭১৯৭৫
ছাপা : সফিক প্রেস, বাংলাবাজার।
প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার
অলঙ্করণ : আজিজুর রহমান

মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র

The Stories of Prophet's Companions

(Sahabider Galpo Shono)
by Iqbal Kabir Mohon
Published by Shishu Kanon
Price : Taka 60.00 only

www.amarboi.org

উৎসর্গ

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ

ডা. জাকির নায়েক

www.amarboi.org

আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের জীবনব্যবস্থা। ইসলাম অর্থ মহান স্রষ্টা আল্লাহতাআলার কাছে আত্মসমর্পণ। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান। যে ঈমান আনে সে মুমিন। একজন মুসলিম যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে তা মূলত তিনটি-এক. তাওহিদ, দুই. রিসালাত ও তিন. আখেরাত।

তাওহিদ মানে আল্লাহর একক সত্তা। যার অর্থ তিনি একাই সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রক ও সংহারক। তাঁর কোনো শরিক নেই। মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। রিসালাত বলতে বুঝায় আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের ওপর অর্পিত নির্দেশ ও বিধান। এ বিধান মানতে মানুষ বাধ্য। আখেরাত হলো দুনিয়ার পরের অনন্তজীবন। মানুষের ভালো ও মন্দের বিচার হবে সেখানে। এ বিচার করবেন মহান স্রষ্টা আল্লাহতাআলা। আর তার ভিত্তিতেই মানুষ লাভ করবে জান্নাত ও জাহান্নাম।

ইসলাম ও ঈমানের এ মহাসত্যকে আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া জরুরি। ছোটবেলা থেকে ঈমানসমৃদ্ধ প্রকৃত মানুষ হিসেবে এদের গড়ে তুলতে হবে। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে 'সাহাবীদের গল্প শোন' বইটি। এর গল্পগুলো বিশ্বাসের চেতনাকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলে আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আল্লাহপাক আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

ইকবাল কবীর মোহন
৩০৭, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭১৩-২২৯৯২৫

www.amarboi.org

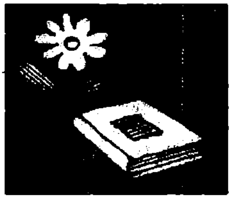

সূচি

দৃপ্ত ঈমানের ফুলকি ০৯

সত্যপিয়াসী সাহাবী তালহা (রা) ১৪

রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা ২১

হযরত খাব্বাব (রা)-এর অনন্য জীবন ২৫

দুরন্ত সাহসী সেনাপতি খালিদ (রা) ৩০

ঈমানের সুরভিত গোলাপ ৩৮

ধনীর দুলাল ওজ্জা হলেন নিঃস্ব ৪৫

www.amarboi.org

সাহাবীদের গল্প শোন

www.amarboi.org

দৃপ্ত ঈমানের ফুলকি

নাম হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা)। দুরন্ত সাহসী এক সাহাবী। অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও অতিশয় দীনহীন। তিনি খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁর জীবনচলায় বাহুল্য বলতে কিছু ছিল না। জাঁকজমক ও চাকচিক্য তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। কোনো রকমে চলতে পারলেই তিনি খুশি হতেন।

একদিনের এক ঘটনা।

শাম দেশের ফাহলে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। খ্রিষ্টান রোমানরা ছিল মুসলমানদের প্রতিপক্ষ। তারা মুসলিম বাহিনীর রণ-প্রস্তুতির কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। রোমানরা ভাবল মুসলমানদের সাথে এখনই যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। তাই রোমান সেনাপতি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলো।

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু উবাইদা (রা)। তখনকার যুগের অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী সেনাপতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। সুনিপুণ যুদ্ধ বিশারদ হিসেবে আবু উবাইদার নাম সর্বত্র আলোচিত হতো। আর মুয়াজ (রা)? তিনিও একজন দক্ষ সমরবিদ ও পারদর্শী কূটনীতিক হিসেবে

www.amarboi.org

ব্যাপকভাবে পরিচিত। জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন অনন্য। তাই সেনাপতি উবাইদা (রা) রোমানদের সাথে আলোচনার জন্য মুয়াজ (রা)-এর নাম ঠিক করলেন। সন্ধি স্থাপনের বিষয়টি যে কারোর পক্ষে আলোচনা করা সমীচীন নয়। এর জন্য চাই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ কূটনীতিক। এ ক্ষেত্রে হযরত মুয়াজই ছিলেন এগিয়ে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) সময়মত রোমান সেনা ছাউনিতে গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু তাঁবুতে পা রেখেই অবাক হলেন তিনি। অতিশয় জাঁকজমক ও চাকচিক্য করে সাজানো হয়েছে সেই তাঁবু। সেখানে বিছানো হয়েছে সোনালী কারুকাজ করা গালিচা। দেখে মনে হলো, এটা যেন এক বাদশাহি বালাখানা।

একজন পদস্থ রোমান সৈনিক তাঁবুর গেটে হযরত মুয়াজকে সাদর সম্ভাষণ জানাল। তারপর রীতি অনুযায়ী তাঁকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল। একটি অনিন্দ্য সুন্দর আসনে নিয়ে তাঁকে বসানো হলো। এসব আয়োজন হযরত মুয়াজের মোটেও পছন্দ হলো না। তাই তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব পরিলক্ষিত হলো। তিনি বললেন : দেখুন ভাই, আমি এসব রাজকীয় জাঁকজমক পছন্দ করি না। কারণ, দরিদ্র মানুষকে শোষিত ও বঞ্চিত রেখে এসব দামি আসন বানানো হয়েছে। একথা বলেই তিনি মাটির ওপর বসে পড়লেন। মুয়াজের অবস্থা দেখে খ্রিষ্টানরা তো হতবাক। একজন সেনা তাই বলল : আপনি এক মহান ব্যক্তি। আপনি দেশের নামীদামি লোক। চারদিকে আপনার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অনেকেই আপনাকে সম্মান করে। আমরাও আপনাকে অসম্ভব সম্মান করি। তাই সম্মানজনক স্থানেই আমরা আপনাকে বসাতে চাই। অথচ আপনি তা পরিহার করলেন?

খ্রিষ্টান সৈন্যের কথা শুনে মুয়াজ (রা) মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন : শোন সেনারা! তোমরা আমাকে অনেক বড় বলে জানলেও আমি কিন্তু তা নই। আমি অতি সাধারণ ও নগণ্য মানুষ মাত্র। অত সম্মান ও চাকচিক্য আমার প্রয়োজন নেই। আর তাই মাটিতে বসতেও আমার অসুবিধা নেই।

হযরত মুয়াজের কথা শুনে খ্রিষ্টানরা আরেকবার বিস্মিত হলো। তারা বলল, কী অবাক কথা বলছেন আপনি! আপনি তো অনেক বড় মাপের মানুষ। আপনি মোটেও সাধারণ নন। তাই মাটিতে বসা আপনাকে মানায় না। মাটিতে তো বসবে দাসেরা।

খ্রিষ্টানদের কথা শুনে মুয়াজ (রা) আরেকবার হাসলেন। তিনি মনে মনে বললেন, তোমরা জান না সৈন্যরা, এ মুয়াজই আল্লাহর বড় দাস। আর এ

www.amarboi.org

দাসের কোনো বিলাসিতা নেই। এবার হযরত মুয়াজ (রা) দৃঢ়ভাবে বললেন

: ভাই, তোমরা ঠিকই বলেছ। মাটিতে বসা দাস শ্রেণীর লোকদেরই কাজ। সমাজে ওরা ছোট, তাই ওরা মাটিতে বসে। আমিও যে আল্লাহর খুবই নগণ্য এক দাস। তাই মাটিতে বসতে পারায় আমি ধন্য হয়েছি।

হযরত মুয়াজ (রা) নিজেকে দাস বলে স্বীকৃতি দেয়ায় খ্রিষ্টানরা অবাক হলো। তাই তারা বিস্ময়ের সাথে হযরত মুয়াজের মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইল। তাদের বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না। তাই হযরত মুয়াজের প্রতি তাদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

: আপনার চেয়েও বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তি কি আপনাদের মধ্যে আরও কেউ আছে?– জিজ্ঞেস করল খ্রিষ্টানদের একজন।

: কী বলছ তোমরা? আমি মর্যাদাবান? কে বলল তোমাদের? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন হযরত মুয়াজ (রা)।

: মুসলমানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমার মতো অধম আর কেউ নেই।– মুয়াজ (রা) আবারো জানালেন।

এবার খ্রিষ্টানদের বিস্ময় আরও একবার বেড়ে গেল। হযরত মুয়াজের কথাবার্তা শুনে তারা বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। মুসলমানদের অর্ন্তনিহিত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে তারা চিন্তায় পড়ে গেল। মুসলমানদের আচরণ, ঐতিহ্য ও উদারতা তাদের মনকে নাড়া দিল। তারা আরও ভাবনায় পড়ল মুসলমানদের সাহস ও বীরত্ব নিয়ে। ফলে রোমানদের মনে ভয়ের উদ্রেক হলো। তারা ভাবল, হযরত মুয়াজই যদি একজন সাধারণ মানুষ হন, তা হলে মুসলমানদের না জানি আরও কত অসাধারণ মানুষ আছেন! এমন অসাধারণ ও খোদাভীরু মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করা মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভের চিন্তা করাও বোকামি। তাই রোমানরা হযরত মুয়াজের সাথে সন্ধি স্থাপন করাকেই শ্রেয় বলে মনে করল। ফলে ভয়ানক যুদ্ধের আশঙ্কা আপাতত কেটে গেল।

হিজরি পনের সনের আরেকটি ঘটনা। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠায় ইয়ারমুক ময়দান কেঁপে উঠল। একদিকে মুসলিম বাহিনী, অন্যদিকে ইসলামবিরোধী কুফরি শক্তি। ভয়ানক যুদ্ধ চলছে ইয়ারমুকে। কুফরের দল সর্বশক্তি নিয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্বে আছেন হযরত মুয়াজ (রা)। যুদ্ধ পরিচালনা করছেন তিনি। মুসলিম

www.amarboi.org

সেনারা প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে পড়ল। শত্রুপক্ষ বেশ শক্তিশালী। তাদের মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ল। তারপরও আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে লড়ছে হযরত মুয়াজের সেনারা। সবার মধ্যে ছিল অদম্য সাহস ও আল্লাহতাআলার ওপর অপার ভরসা।

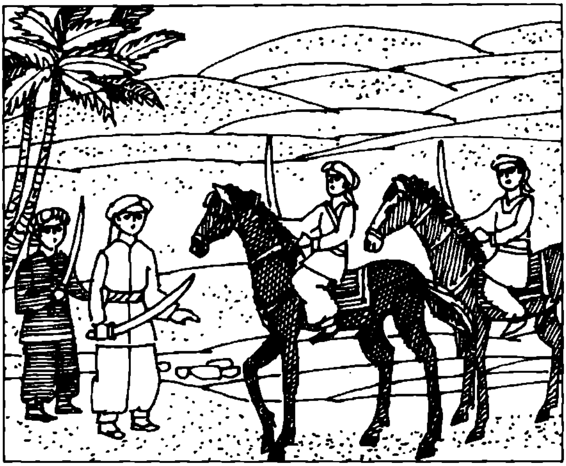

সেনাপতি মুয়াজ (রা) আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থাশীল। ঈমানের দৃঢ়তা ও সত্যের পাহাড়সম শক্তি তাঁর বুকে অসীম সাহসের ফুলকি ছড়াচ্ছে। হযরত মুয়াজের স্বপ্ন আল্লাহর দীনের গোলাপের পাপড়িতে ভরা। আল্লাহর মদদ যে হযরত মুয়াজের সাথে আছে তা তিনি ভালো করেই জানেন। তাই শত্রুরা প্রবল গতিতে ছুটছে দেখেও সেনাপতি বিচলিত হলেন না।

হযরত মুয়াজ (রা) এতক্ষণ তাঁর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার অবস্থায় ছিলেন। তিনি সবকিছু গভীর মনোযোগসহকারে দেখছিলেন। আর যুদ্ধের কৌশল নিয়ে ভাবছিলেন। এবার তিনি ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে পা রাখলেন। তাঁর সাথেই লড়তে এসেছে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র। হযরত মুয়াজ ঘোড়াটি পুত্রের জন্য ছেড়ে দিলেন। মুয়াজ এবার নিজ পুত্রকে সাথে নিয়ে জ্বলে উঠলেন। প্রচণ্ড সাহস ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে হযরত মুয়াজ (রা) শত্রুদের মোকাবেলা করলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল মুসলিম সেনারা। ফলে ক্ষণিকের মধ্যেই পাল্টে গেল ইয়ারমুক ময়দানের দৃশ্য। হযরত মুয়াজ রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

www.amarboi.org

সেদিন প্রাণপণে লড়লেন মুয়াজ (রা)। তাঁর সাহসের ফুলকিতে শত্রুরা পিছু হটতে শুরু করল। ফলে ইয়ারমুকে বিজিত হলো মুসলিম বাহিনী। শত্রুদের অনেকেই মারা পড়ল। কেউ বা বন্দী হলো। যারা ময়দান ছেড়ে পালাতে পারল, তারা জানে বেঁচে গেল।

হযরত মুয়াজের সাহসের আগ্নেয়গিরি ক্ষণিকের মধ্যে রোমান বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত করল। তাঁর সাহস ও আল্লাহর মদদে শত্রুদের সব বাধা তছনছ হয়ে গেল। ফলে আল্লাহর সৈনিকদের মুখে হাসি ফুটল। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ছিল এই হাসি। হযরত মুয়াজের দৃপ্ত ঈমানের ফুলকির কাছে মিথ্যার পাহাড় ভেঙেচুরে মাটিতে মিশে গেল।

বলতে পারো?

১. ফাহলের যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?

২. হযরত মুয়াজ কেমন লোক ছিলেন?
তাঁকে কেন সন্ধি আলোচনার জন্য ঠিক করা হলো?

৩. হযরত মুয়াজ মাটিতে বসে কী উক্তি করেছিলেন?

৪. ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?

৫. ইয়ারমুকে কারা পরাজিত হলো?

www.amarboi.org

সত্যপিয়াসী সাহাবী হযরত তালহা (রা)

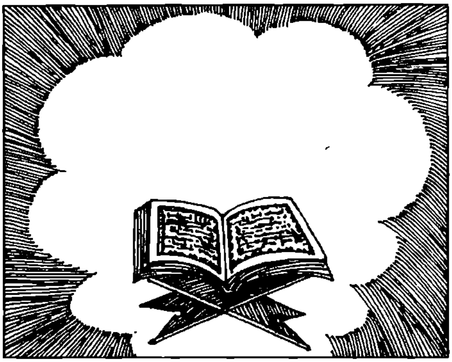

হযরত তালহা (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম। একসময় তিনি ব্যবসার কাজে গিয়েছিলেন সিরিয়ায়। তাঁদের বাণিজ্য কাফেলা গিয়ে থামল এক বিশাল বাজারের পাশে। তাই সেখানে ছিল অনেক মানুষের ভিড়। কেউ ক্রেতা, কেউ বা বিক্রেতা। দূর-দূরান্ত থেকে এখানে ছুটে এসেছে লোকজন। হযরত তালহা (রা) এসেছেন সুদূর মক্কা থেকে। উট-ঘোড়া-গাধাগুলো বেঁধে কাফেলার লোকজন ঢুকল বাজারে। হযরত তালহা (রা) লোকের ভিড় ঠেলে বাজারে একটি গলিপথ ধরে হাঁটছিলেন।

এমন সময় তাঁর কানে ভেসে এলো কোনো একজনের ভাষণের একটি আওয়াজ। তবে তা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে তিনি কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলেন না। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, খানিকটা দূরে একটু উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে একটা লোক হাত নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বলছে। পাশে অনেক লোকের একটা জটলাও দেখা গেল। হযরত তালহা (রা) লোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি শুনলেন লোকটি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে, হে

www.amarboi.org

আমার ভাইয়েরা, এখানে কি মক্কার কোনো লোক আছে? তোমরা কি কোনো মক্কাবাসীর সন্ধান দিতে পার?

লোকটার কথা শুনে হযরত তালহা (রা)-এর মনে খটকা লাগল। কী ব্যাপার! লোকটা মক্কার অধিবাসী খুঁজছে কেন? আর সেখানকার লোক খুঁজতে এভাবে চিৎকার করেই বা বলতে হবে কেন? লোকটা কি কোনো সমস্যায় পড়ল, নাকি সে কারও খোঁজ নিতে মক্কার লোক খুঁজছে? তালহা (রা) ভাবতে ভাবতে কয়েক কদম সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর হাত উঁচু করে লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং বললেন,

: হ্যাঁ আমি আছি। আমি মক্কাবাসী। আমি কুরাইশ বংশের লোক। তুমি চাইলে আমাকে বলতে পার।

তালহা (রা)-এর কথা শুনে লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর চোখেমুখে যেন স্বস্তির আভা ফুটে উঠল। মনে হলো লোকটা যেন বহুদিন খুঁজে মক্কার এ লোকটির সন্ধান পেয়েছে। তাই দেরি না করে লোকটি হযরত তালহা (রা)-এর দিকে এসে বলল,

: তুমি মক্কা থেকে এসেছ? আচ্ছা, তুমি কি বলতে পার, তোমাদের দেশে আহমাদ নামে কি কেউ আসছে?

কথা শুনে তালহা (রা) ভাবনায় পড়ে গেলেন। লোকটার প্রশ্ন নিয়ে ভাবেন আর অবাক হন। বারবার ভালো করে তাকিয়ে দেখেন লোকটাকে। লোকটাকে পাগল বলে মনে হয় না। তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুও লক্ষ করা যায় না। লোকটার শরীরে পাদরীর পোশাক, মানে লোকটা ধর্মে খ্রিষ্টান। দেখতে দেখতে তালহা (রা)-এর মন উৎসুক হয়ে উঠল। তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন,

: আচ্ছা জনাব, আহমাদের কথা কেন জানতে চাইলেন? সে কার ছেলে? কী তার পরিচয়?

: তা হলে শোন, বলছি। আবদুল্লাহর পুত্র আহমাদ। তিনি এ মাসেই মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি শেষ নবী হয়ে এসেছেন।

: আবদুল্লাহর পুত্র আহমাদ! কই এ নামে কাউকে তো জানি না। এমন কারও নাম তো শুনিনি? নবী হবার এমন দাবির কথাও আমি জানি না। আচ্ছা, তুমি এসব জানলে কিভাবে?– তালহা (রা) প্রশ্ন করেন লোকটাকে।

: তা হলে মন দিয়ে শোন। আজ থেকে সাড়ে পাঁচশত বছর আগের

www.amarboi.org

কথা। দুনিয়ায় এসেছিলেন একজন নবী। নাম তাঁর ঈসা (আ)। আমরা তাঁকে যীশু বলে ডাকি। তাঁর ওপর এক আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল। কিতাবের নাম ইঞ্জিল। এ কিতাব মহান প্রভু আল্লাহতাআলার কাছ থেকে নাজিল হয়েছিল। এ কিতাবেই লেখা আছে আহমাদের নাম, তাঁর নবী হওয়ার কথা। এ রমজান মাসেই তিনি নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। ইঞ্জিলের এ কথা মিথ্যা হতে পারে না। অবশ্যই আহমাদ নামে একজন নবী আসবেন।

লোকটার কথা যতই শুনছিলেন তালহা (রা) ততই যেন অবাক হচ্ছিলেন। তাঁর সত্যসন্ধানী মনের গভীরে চলছিল তোলপাড়। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি উতলা হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখেমুখে এক নূরানী আভা যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। লোকটা তালহার এ পরিবর্তন গভীরভাবে লক্ষ করলেন। তালহা (রা)-এর মধ্যে এ অস্থিরতা দেখে লোকটা বললেন,

: হে যুবক! ব্যবসার কথা ভুলে যাও। এখনই চলে যাও মক্কায়। আহমাদ নামে লোকটিকে খুঁজে বের কর। তাঁর কথা শোন এবং তাঁর সাথেই থাক।

তালহা (রা) লোকটার কথা শুনতে শুনতে একসময় যেন চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মন চলে যায় সুদূর মক্কায়। এক ফাঁকে পাদরী কখন যে তাঁর দৃষ্টি থেকে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যান তিনি বলতে পারেন না। তালহা

www.amarboi.org

(রা)-এর মন আবার উতলা হয়ে ওঠে। ব্যবসার কাজে এসেছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন বসছে না। ঘুরেফিরে পাদরীর কথাই তাঁর মনে বারবার উঁকিবুকি মারে। আহমাদের খবর জানতে তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে।

অবশেষে তালহা (রা) তাঁর কাফেলার সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা করেন মক্কায়। পথিমধ্যে যাকে পান তাকেই বলেন,

: তুমি কি মুহাম্মদকে চেন? তিনি নাকি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছেন? তোমরা কি জান তাঁর ঠিকানা?

লোকজন তালহা (রা)-এর কথা শুনে অবাক হয়। কেউ বা বলে লোকটা পাগল নাকি? আরে কী বলে এসব? অনেকে আবার নানা কথা বলে যে যার কাজে চলে যায়।

এভাবে পথ চলতে চলতে তালহা (রা) একসময় নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর মধ্যে উতলা উতলা ভাব। এক অজানা অস্থিরতা তাঁকে যেন ঘিরে রেখেছে। তাই স্বজনরা তাঁর চারপাশে এসে ভিড় করে। তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। সবাই বলে, কী হলো ছেলেটার? কোনো অঘটন ঘটেনি তো? কাফেলার লোকদের সাথে ঝামেলা বাধেনি তো? সবাই তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তিনি তার কোনো জবাব দেন না। একসময় তালহা (রা) আত্মীয়দের বলেন,

www.amarboi.org

: আচ্ছা, তোমরা কি আহমাদ নামে কাউকে চেন, কাউকে কি তোমরা নবী বলে দাবি করতে শুনেছ?

হযরত তালহার প্রশ্ন শুনে আত্মীয়-স্বজনরা সবাই তো হতবাক। তাদের সবার প্রশ্ন, একি কথা বলছে তালহা! ওর হলো কী? ও কার কথা বলছে? কেউ বা বলে ছেলেটার মাথা খারাপ হলো নাকি?

আপনজনরা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। বিশ্রাম নিতে বলেন। কিন্তু তালহা (রা)-এর অস্থিরতা কাটে না। কারও সান্ত্বনা বা অভয় হযরত তালহাকে টলাতে পারে না। তাঁর কথা একটাই,

: তোমরা বলো, কে এই আহমাদ? তিনি কোথায়? তাঁর সন্ধান আমাকে দাও। এভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ একজন বলে ওঠে,

: তালহা! বলি শোন। জানতে পারলাম, হাশেমি বংশের ছেলে আবদুল্লাহর পুত্রের নাম নাকি মুহাম্মদ। শুনেছি, তিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন। তাঁর ওপর নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়েছে!

লোকটার কথা শুনে চমকে ওঠেন তালহা। তা হলে পাদরীর কথাই কি সত্যি! তালহা (রা) অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করেন,

: আচ্ছা, কবে তিনি নবী দাবি করেছেন? তিনি কী বলেছেন, শুনি।

লোকটি বলল,

: শোন, তা হলে, সেদিনের কথা। তুমি ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় যাওয়ার পরপরই ঘটে গেল সেই ঘটনা। কী অবাক কাণ্ড! আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সা) নিজেকে নবী বলে দাবি করলেন। এ নিয়ে যে কত কথা, কত আলোচনা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এটা নিয়ে নানাজন নানা কথা বলছে। অনেকেই মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। শুনলাম, আবু কোহাফার ছেলে আবু বকর (রা)ও নাকি তাঁর দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে।

লোকটার মুখে মুহাম্মদ (সা)-এর খবর শুনে তালহা (রা)-এর মন উতলা হয়ে উঠল। হযরত আবু বকর (রা)-কে তিনি ভালো করেই জানেন। তাঁর সাথে হযরত তালহা (রা)-এর খুব জানাশোনা আছে। তাই তালহা (রা) তাঁর মন আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি ছুটে গেলেন আবু বকর (রা)-এর কাছে। তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম, মুহাম্মদ (সা) নবী হয়েছেন, আপনি কি এ খবর জানেন?

www.amarboi.org

: তুমি ঠিকই শুনেছ। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সা) নবী হয়েছেন। তাঁর ওপর ওহি নাজিল হয়েছে।– জানালেন হযরত আবু বকর (রা)।

: তা হলে আপনিও কি তাঁর অনুসারী হয়েছেন?

: হ্যাঁ তালহা। তোমার অনুমান ঠিক। আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি।

একথা শুনে হযরত তালহা (রা)-এর মন কেঁপে উঠল। আবু বকর (রা)-এর কথায় তালহা (রা)-এর মনের দুয়ার খুলে গেল। আবু বকর (রা) তালহা (রা)-এর মনের অবস্থা অনুমান করতে পারলেন। তাই তিনি বললেন,

: শোন তালহা! মিথ্যা ও অন্যায় আর কতকাল চলবে? মিথ্যার বেসাতি করে কী লাভ? মূর্তি পূজার কোনো মানে হয় না, বরং চলে এসো, এক আল্লাহর পথে। তাঁর দরবারে মাথা নত করাই শ্রেয়।

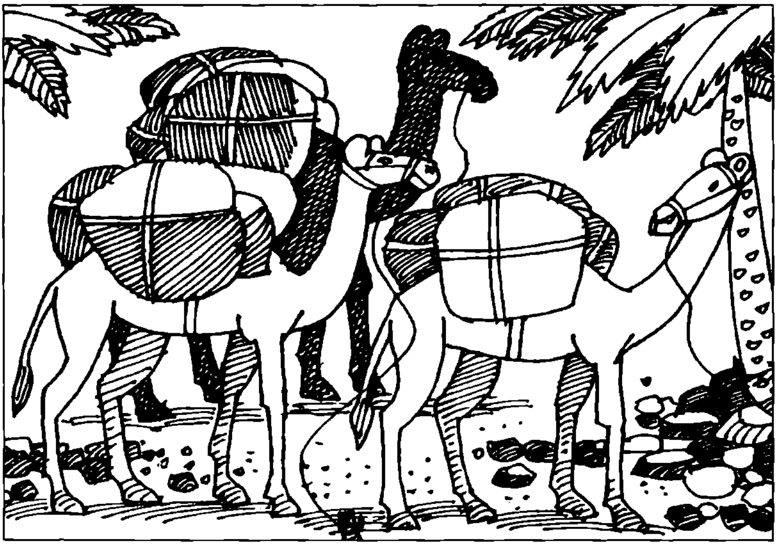

হযরত আবু বকর (রা)-এর কথা শুনে তালহা (রা) আর কিছুই বলতে পারলেন না। খানিকক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকলেন আবু বকর (রা)-এর দিকে। তাঁর মনের গভীরে কী যেন এক তোলপাড় খেলে গেল। আবু বকর (রা) তালহা (রা)-এর পরিবর্তন লক্ষ করে মনে মনে মহান স্রষ্টা আল্লাহর

www.amarboi.org

শোকরিয়া জানালেন। আর দেরি না করে আবু বকর (রা) হযরত তালহা (রা)-কে নিয়ে মহানবী (সা)-এর দরবারে হাজির হলেন।

পথে যেতে যেতে তালহা (রা)-এর মনে আল্লাহর নবী সম্পর্কে কল্পনার নানা ফানুস উড়ছিল। তাঁর কোনো কিছুই যেন সহ্য হচ্ছিল না। মহানবী (সা)-কে দেখে তাঁর অতৃপ্তির চোখ কখন জুড়াবেন, সে জন্যই যেন তাঁর এই অস্থিরতা। তালহা (রা) যখন মহানবী (সা)-এর সামনে গিয়ে হাজির হলেন, তখন সীমাহীন প্রশান্তির এক বেহেশতি আবেশ তাঁর দেহমন ছুঁয়ে গেল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আর তখনই তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করে নিলেন, শামিল হয়ে গেলেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

এভাবে হযরত তালহা (রা)-এর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হলো। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতের বছর।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত তালহা (রা) ব্যবসার কাজে কোথায় গেলেন?

২. তালহা (রা) বাজারে গিয়ে কী শুনতে পেলেন?

৩. লোকটি কার খোঁজ করছিল?

৪. লোকটি তালহা (রা)-কে কার ব্যাপারে কী বলেছিল?

৫. হযরত তালহা (রা) কিভাবে মুহাম্মদ (সা)-এর কথা জানতে পারলেন?

৬. আবু বকর (রা) তালহাকে কী বললেন?

৭. কত বছর বয়সে তালহা (রা) ইসলাম কবুল করেন?

www.amarboi.org

রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন দুনিয়ার সেরা মানুষ। তাঁর কথা, কাজ, আচরণ, ব্যবহার সবই ছিল অতুলনীয়। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য সবাইকে মুগ্ধ করত। তাঁকে ভালোবেসে কত মানুষের মন যে বিগলিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মহানবী (সা)-কে কাছে পেয়ে অনেকে তাঁর জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছে। অনেকের কাছে প্রিয় নবীর সান্নিধ্য মা-বাবার আদরের চেয়েও তুচ্ছ মনে হয়েছে। তাদেরই একজন হযরত জায়েদ (রা)। পিতার নাম হারেসা। তিনি বিশ্বাসে ছিলেন খ্রিষ্টান।

হযরত জায়েদ তখন খুব ছোট। চাঁদের মতো ফুটফুটে শিশু জায়েদ। মায়ের কলিজার টুকরো এ শিশু। জায়েদকে মা বুকে জড়িয়ে রাখেন। সোনামণিকে আদর করে মায়েরা যেমন প্রাণ জুড়ান, জায়েদের মায়ের অবস্থাও সে রকমই। কিন্তু জায়েদকে বেশি দিন আদর করার ভাগ্য মায়ের হয়ে ওঠেনি।

একদিন মা আদরের সন্তানকে নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিলেন। আরব দেশের মরুময় পথ। সে জামানায় মরুপথে যাতায়াত ছিল সীমাহীন

www.amarboi.org

কষ্টকর। তখন সূর্যের প্রচণ্ড তাপ মাথায় নিয়ে চলতে হতো। তা ছাড়া ডাকাতের উপদ্রব তো ছিলই। ডাকাতরা মরুভূমির ফাঁক-ফোকরে ওঁৎ পেতে বসে থাকত। সুযোগ পেলেই এরা অকস্মাৎ পথচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং লোকজনের সর্বস্ব লুট করে নিত। অনেক সময় ডাকাতরা লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে যেত। এসব বন্দীকে তারা ক্রীতদাস হিসেবে হাট-বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিত।

জায়েদ ও তাঁর মায়ের ভাগ্যেও ঘটল একই ঘটনা। তারা ডাকাতের হাতে পড়লেন। তস্কররা তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল। ছোট বালক জায়েদসহ অনেককে ডাকাতরা বন্দী করল। একদিন জায়েদকে বিক্রি করে দেয়া হলো। এ সুযোগে হাকিম নামে এক লোক জায়েদকে কিনে নিল।

হাকিম ছিলেন হযরত খাদিজা (রা)-এর আপনজন। হাকিমের খালা তিনি। হাকিম জায়েদকে এনে খালা খাদিজার হাতে সমর্পণ করলেন। খাদিজা (রা) ছিলেন আরবের সেরা ধনী মহিলা। তাই তাঁর ঘরে অনেক দাস-দাসী কাজ করত। আরও কাজের লোক চাই তাঁর। তাই জায়েদকেও তিনি কাজের জন্য রেখে দিলেন। খাদিজার ঘরে বালক জায়েদ বড় হতে লাগলেন। জায়েদ ছিলেন খুব বিশ্বস্ত ও কর্মঠ।

চল্লিশ বছর বয়সে হযরত খাদিজার সাথে মহানবী (সা)-এর বিয়ে হলো। এবার হযরত খাদিজা বালক জায়েদকে স্বামীর খেদমতে নিয়োগ করলেন। মহানবী (সা)-এর সান্নিধ্য পেয়ে জায়েদ তো মহাখুশি। আল্লাহর নবীর সাথে থাকা যে বড় ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যবান না হলে কেউ আল্লাহর নবীর এত কাছের জন হতে পারত না। খাদিজা (রা) যেমন জায়েদকে ভালোবাসতেন, তেমনি মহানবী (সা)ও তাঁকে আদর করতেন।

ছোটবেলা থেকে জায়েদ মা-বাবার তেমন একটা আদর পাননি। তাতে কী? তিনি হযরত খাদিজার কাছে মায়ের চেয়েও বেশি আদর পেয়েছেন। আর এখন মহানবী (সা)-এর কাছে পেলেন বাবার আদর। ফলে তাঁর আনন্দ ও সুখ আর কে দেখে? এমনি করে জায়েদের দিনগুলো সুখে-আনন্দে ভালই কাটছিল। মহানবী (সা)-এর খেদমত আর ইসলামের কাজ ছাড়া তাঁর কোনো ভাবনা নেই। নেই কোনো পিছুটানও।

তবে একদিন ঘটল এক ঘটনা। একদল হজযাত্রী কাবাঘর জেয়ারত করতে মক্কায় এলো। তাদের সাথে হযরত জায়েদের দেখা হলে যাত্রীদের একজন হযরত জায়েদকে চিনে ফেলল। সে নিশ্চিত হলো, এই বালকই

www.amarboi.org

হারেসার হারানো পুত্র জায়েদ। তাই তারা বিষয়টি হারেসাকে জানাবে বলে ভাবল। হজ সেরে লোকেরা বাড়িতে ফিরে হারেসাকে ঠিকই সবকথা খুলে বলল। প্রাণপ্রিয় পুত্র জায়েদের খবর শুনে বাবা হারেসার বুক খুশিতে লাফিয়ে উঠল। তাই কালবিলম্ব না করে সে তড়িঘড়ি করে মক্কায় হাজির হলো। জায়েদ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে থাকেন। তাই হারেসা সোজা মহানবী (সা)-এর বাড়িতে গিয়ে উঠল।

মহানবী (সা)-এর বাড়িতে গিয়ে হারেসা ঠিকই জায়েদকে দেখতে পেল। অনেকদিন পর প্রাণাধিক পুত্রের মুখ দেখে হারেসার চোখ বেয়ে নেমে এলো আনন্দ অশ্রু। সে মহানবী (সা)-কে বলল,

: দেখুন নবীজি! জায়েদ আমার ছেলে, বুকের ধন, ও আমার হারিয়ে যাওয়া মানিক। আমি ওকে নিতে এসেছি। জায়েদকে দয়া করে ফিরিয়ে দিন। এ জন্য যা মূল্য চান আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি তো মহামানব। তাই না করবেন না। আমার ছেলে আমাকে ফিরিয়ে দিন।

মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর নবী। মানবতার দিশারি তিনি। মানুষের কল্যাণে তাঁর প্রাণ ছিল অবারিত, উদার। তিনি মানুষের প্রভু হতে আসেননি, এসেছেন মানুষের বন্ধু হয়ে। মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির সওগাত নিয়ে তিনি দুনিয়ায় এসেছেন। তিনি দয়া, মায়া, মমতা ও মানবতার অগ্রদূত। মা-বাবার কাছে সন্তানের যে মূল্য তা তিনি সম্যক অনুধাবন করতে পারেন। তাই জায়েদের পিতা হারেসার দুঃখ তিনি বোঝেন। জায়েদের জন্য কী মুক্তিপণ নেবেন মহানবী (সা)! বরং তিনিই তো মানুষকে তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দেন।

এ ক্ষেত্রেও মানবতার দিশারি তার প্রমাণ দিলেন। জায়েদ তাঁর সেবক। শুধু সেবক বললে ভুল হবে। তিনি আল্লাহর নবী (সা)-এর খুবই প্রিয়জন। তারপরও মহানবী (সা) নিজের কথা ভাবলেন না। জায়েদকে তিনি হাসিমুখে হারেসার হাতে তুলে দিলেন। হারেসা তো হতবাক। এত সহজে ছেলেকে ফিরে পাবেন, তা ছিল হারেসার কল্পনারও বাইরে। মহানবী (সা)-এর উদারতা দেখে হারেসা আবেগে-কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলো। তার খুশি আর কে দেখে? কারও হারানো পুত্র ফিরে পাবার আনন্দ ও তৃপ্তি যে কত মধুর তা ঐ মা-বাবা ছাড়া আর কারো অনুধাবন করাও কঠিন। আজ হারেসার মনের অবস্থাও তাই। পুত্র জায়েদকে পেয়ে হারেসার বুক ভরে গেল। সে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

www.amarboi.org

এমন সময় ঘটল উলটো এক ঘটনা। জায়েদ এতক্ষণ ধরে সবই শুনছিল। এবার সে বেঁকে বসল। তার এক কথা, রাসুল (সা)-কে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। জায়েদ বলল : আমি আমার বাবা ও মাকে পেয়ে গেছি। নবীজি আমার বাবা, খাদিজা (রা) আমার মা। তাঁরাই আমাকে সত্যিকারের আদর করেছেন। আমি বাবা-মাকে ছেড়ে কোথাও কারও কাছে যাব না।

বাবা হারেসা জায়েদের অনড় অবস্থা দেখে হতাশ হলেন। পুত্রকে অনেক করে বুঝালেন। কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। এতে জায়েদের মন গলল না। অগত্যা হারেসাকে খালি হাতেই ঘরে ফিরে যেতে হলো। জায়েদ এবার মনের সুখে মহানবী (সা)-এর সেবা করে যেতে লাগলেন। এভাবেই জায়েদ আজীবন মুহাম্মদ (রা)-এর কাছে থেকে গেলেন।

দেখতে দেখতে জায়েদ বড় হলেন। বিয়ে শাদির সময় হলে নবীজির আপন চাচাতো বোন জয়নাবের সাথে তাঁর বিয়ে দেয়া হলো। ফলে নবী পরিবারের সাথে জায়েদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হলো। জায়েদের এক ছেলে সন্তান ছিল। নাম উসামা। নবীজি তাকে বড্ড বেশি আদর করতেন। নবীজি তাঁর প্রিয় নাতি হাসান-হোসেনের মতোই উসামাকে ভালোবাসতেন।

মক্কা বিজয়ের দিনের এক ঘটনা। মহানবী (সা) উটে চড়ে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর সাথে উটের পিঠে বসেছিলেন উসামা। তা থেকেই বোঝা যায়, উসামা মহানবী (সা)-এর কত কাছের জন ছিলেন। মহানবী (সা)-এর গভীর ভালোবাসা পেয়ে জায়েদ বাবা-মাকে পর্যন্ত ভুলে যেতে পেরেছেন। মহানবী (সা)-এর ভালোবাসার কাছে জায়েদের সবই ছিল তুচ্ছ। জায়েদের কাছে মহানবী (সা) ছিলেন এক পরশ পাথর। তাঁর জাদুকরী ছোঁয়ায় জীবন বদলে গিয়েছিল জায়েদের। এভাবে আরও কত লাখো কোটি মানুষের জীবনকে আল্লাহর নবী (সা)-এর আদর্শ বদলে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

ব ল তে পা রো ?

১. জায়েদ কে ছিলেন? তাঁর পিতার নাম কী?

২. একদিন বেড়াতে গিয়ে জায়েদের ভাগ্যে কী ঘটল?

৩. জায়েদের খবর কারা তার বাবাকে জানাল?

৪. জায়েদের পিতা মহানবী (সা)-কে গিয়ে কী বলেছিল?

www.amarboi.org

হযরত খাব্বাব (রা) -এর অনন্য জীবন

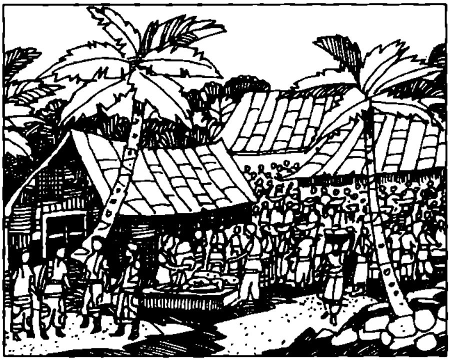

মক্কার কাফের মুশরেকরা ছিল প্রবল ক্ষমতাধর। তারা ছিল প্রচণ্ড ইসলামবিরোধী। কাফেরদের বেশির ভাগই ছিল ভয়ানক প্রকৃতির লোক। একেবারে ক্ষ্যাপা হায়েনার মতো ভয়ানক। উম্মে আনমার তাদেরই একজন। সে ছিল ব্যবসায়ী। দাস বেচা-কেনা ছিল তার পেশা। দাসরাও তো অন্যদের মতোই মানুষ ছিল। তবুও তখনকার দিনে বাজারে নিয়ে দাসদের কেনা-বেচা করা হতো। মানুষকে মানুষ বেচত, কেউবা তাকে কিনত। এরকম কাজ যে কতটা অমানবিক ছিল তা কল্পনা করাও কঠিন। তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মুহাম্মদ (সা) এ অপমানজনক পেশার অবসান ঘটালেন।

উম্মে আনমার দাস বেচাকেনা করলে কী হবে? তার নিজের জন্যও একটা দাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই সে একজন বলিষ্ঠ ও ছটপটে দাস খুঁজছিল।

দাস কেনার জন্য আনমার একদিন বাজারে গেল। শত শত দাস উঠেছে বাজারে। এদের মধ্যে একজনকে আনমারের খুব পছন্দ হলো। দাসটি ছিল বেশ জোয়ান ও শক্ত-সমর্থ। দাসটির নাম খাব্বাব। তাকে বেশ ভদ্র ও বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছিল। তাই দাসটিকে পেয়ে আনমার যারপরনাই খুশি

www.amarboi.org

হলো। বিক্রেতার দাবি মিটিয়ে আনমার খাব্বাবকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। সে দাসটিকে তরবারি তৈরির কলাকৌশল শেখানোর পরিকল্পনা নিল। তাই তাকে মক্কায় একজন কর্মকারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। খাব্বাব ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান। তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই তরবারি বানানো শিখে ফেললেন। হযরত খাব্বাবের বুদ্ধিমত্তা ও গুণের কারণে আনমার যারপরনাই খুশি হলো। দাসটির সাহস, যোগ্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠা আনমারকে বিস্মিত করল।

তখন ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। মহানবী (সা) অতি গোপনে দীনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা তাঁর সাথী হয়েছেন তাঁরাও অতি সাবধানে মানুষকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। ইসলাম প্রচারের এ খবর হযরত খাব্বাবের কানে এসে পৌঁছল। আর যায় কোথায়? তাঁর মন ছিল সত্যের প্রতি অনুরাগী। তাই হযরত খাব্বার (রা) আর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি চুপি চুপি মহানবী (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর মনের বাসনা খুলে বললেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম কবুল করার ফলে বদলে গেল হযরত খাব্বাবের জীবন। দীনের পরশ তাঁকে সত্যের প্রতি আরও বেশি আকুল করে তুলল। খোদায়ী দীনের স্পর্শ পেয়ে তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। এখন তাঁর একটাই ভাবনা। আল্লাহর কথা কিভাবে প্রচার করা যায়। কিভাবে ইসলামের আলো পথহারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়। তিনি কামারশালায় কাজ করেন। আর ফাঁকে ফাঁকে শুধু আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

খাব্বাব (রা) নিজে থেকে না বললেও তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর চাপা থাকল না। বাতাসের বেগে তা মক্কার সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। এ খবর মনিব আনমারের কানেও গেল। দাস ইসলাম কবুল করেছে! আনমারের মাথায় আগুন ধরে গেল। তাই ইসলামবিরোধী আনমার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ক্ষণিকের মধ্যেই আনমার তার দলবলসহ কামারশালায় গিয়ে হাজির হলো। সেখানে পেয়ে গেল খাব্বাবকে। আর যায় কোথায়? প্রচণ্ড রাগ ও উত্তেজনায় কাঁপছে আনমার। সে হুঙ্কার ছেড়ে বলল,

: তুই না কি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছিস? বল, জবাব দে?

: হ্যাঁ করেছি, জবাব দিলেন খাব্বাব।

www.amarboi.org

এমনিতেই আনমার ছিল বেশ উত্তেজিত। মুখের ওপর খাব্বাবের জবাব শুনে সে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো রেগে গেল। আনমার রাগতস্বরে বলল,

: তোর এত বড় সাহস? আমার কেনা গোলাম হয়ে তুই আমার ধর্ম ত্যাগ করেছিস? তুই নাস্তিক হয়ে গেছিস? বলতে বলতে খাব্বাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আনমার। তার দলের লোকেরা কামারশালার হাতুড়ি ও লোহার পাত দিয়ে হযরত খাব্বাবকে পেটাতে লাগল। গায়ে যত শক্তি ছিল তা দিয়ে খাব্বাব (রা)-কে এলোপাতাড়ি মারতে লাগল।

ফলে আঘাতের পর আঘাতে খাব্বাবের দেহ ক্ষতবিক্ষত হলো। তাঁর শরীরের চামড়া ছিঁড়ে গেল। মাথা কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। টাটকা খুন ঝরতে ঝরতে খাব্বাবের দেহ প্রায় অবশ হয়ে পড়ল। অত লোকের শত আঘাত তিনি আর সইতে পারছিলেন না। ফলে একসময় জ্ঞান হারালেন। সেদিন তো এভাবেই কেটে গেল। মারের এই ধাক্কা সামলাতে তাঁকে যে কী কষ্ট পেতে হয়েছে তা বর্ণনা করাও কঠিন। তারপর থেকে আরও বহুবার খাব্বাবকে অনেক জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। মার খেয়েছেন, জীবনেরও হুমকি এসেছে। তারপরও হযরত খাব্বাব (রা) দীনের স্পর্শ ত্যাগ করেননি।

অনেক সময় মনিবের লোকেরা তাঁকে পশুর মতো করে টেনে-হিঁচড়ে মরুভূমিতে নিয়ে যেত। ভর দুপুরে মরুভূমি আগুনের ফুলকি ছড়াত। আর এ সময় দুশমনরা হযরত খাব্বাবকে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখত। কখনও তাঁর শরীরে লোহার বর্ম পরানো হতো। ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। মাঝে মাঝে ফুটন্ত বালুতে উপুড় করে শুইয়ে খাব্বাবকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফেলে রাখা হতো। ফলে গরমে তাঁর চামড়া পুড়ে যেত। অনেক সময় গরমে ঘাম ঝরতে ঝরতে খাব্বাব (রা) অবশ হয়ে যেতেন। তখন তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যেতে চাইত। তিনি পানি চেয়ে চিৎকার করতেন। এতে কাফেররা খুশি হতো। তারা হায়েনার মতো কপট হাসি হেসে খাব্বাবকে উপহাস করত। এক ফোঁটা পানি তো দিতই না, বরং তারা খাব্বাবকে উদ্দেশ করে বলত,

: বোঝ মজা। মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করার শাস্তি বোঝ। এবার মাথা ঠিক হয়েছে তো? তা হলে ইসলাম ত্যাগ কর। নতুন ধর্ম ত্যাগ করলে তোকে ছেড়ে দেব। পানি, খাবার সবই পাবে। শুধু বল, আমি মুহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দিলাম।

www.amarboi.org

হযরত খাব্বাব (রা) দুশমনদের কথা শুনে আরও দৃঢ় হন। তাঁর মুখে তখন জোরে জোরে ধ্বনিত হতো মহান আল্লাহর নাম। আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে একসময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। তারপর আবারও জ্ঞান ফিরে এলে আল্লাহকেই ডাকতে থাকতেন।

হযরত খাব্বাবের ওপর দিনের পর দিন ধরে চলত এ ধরনের নির্যাতন। উম্মে আনমারের বদমেজাজি ও অত্যাচারী এক ভাই ছিল। সে ছিল আরও নিষ্ঠুর। সে প্রতিদিন খাব্বাবের কামারশালায় যেত। এসেই উত্তপ্ত লোহার পাত তুলে চেপে ধরত খাব্বাবের মাথায়। এতে তীব্র যন্ত্রণায় খাব্বাব (রা) জবাই করা পশুর মতো ছটফট করতেন। কখনও কখনও ছটফট করতে করতে খাব্বাবের জ্ঞান হারিয়ে যেত। হুঁশ ফিরে এলে তাঁকে আবারও নির্যাতন করা হতো। তারপরও তিনি দমে যাননি। কোনো অত্যাচারকেই খাব্বাব পরোয়া করতেন না।

হযরত খাব্বাব ছিলেন অতিশয় দরিদ্র। তবে তাঁর মন ছিল সত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরপুর। তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো দৃঢ়চেতা ও অনড়। মহান আল্লাহকে ভালবেসে তিনি আরও ইস্পাত কঠিন হয়ে ওঠেন।

www.amarboi.org

তিনি একাই কাফের কুরাইশদের সাথে লড়াই করেছেন। তাদের অন্যায় ও অসত্য অহমিকাবোধকে রুখে দাঁড়িয়েছেন। কাফেরদের শত নিপীড়নের মুখেও মিথ্যা ও অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেননি, সত্যের পথ থেকে একচুলও নড়েননি। হযরত খাব্বাব (রা) আমাদের জন্য তাই অনন্য আদর্শ হয়ে আছেন।

বলতে পারো?

১. উম্মে আনমার কে? সে কিসের ব্যবসা করত?

২. হযরত খাব্বাবকে কে কিনে নিল? তাঁকে কী কাজ শেখানো হলো?

৩. ইসলাম গ্রহণ করলে খাব্বাব (রা)-এর ওপর কিরূপ নির্যাতন নেমে এলো?

৪. খাব্বাব (রা)-কে মরুভূমিতে নিয়ে কিভাবে নির্যাতন করা হতো?

৫. খাব্বাব (রা)-এর আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?

www.amarboi.org

দুরন্ত সাহসী সেনাপতি হযরত খালিদ (রা)

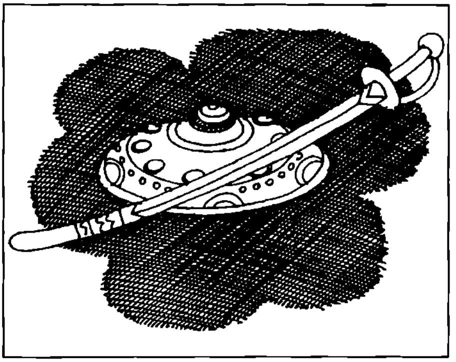

এক, ইসলামের আলো মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। মানুষ দলে দলে এসে ইসলামের পতাকাতলে জমায়েত হচ্ছিল। সুদূর মদীনায় পৌঁছে গেল দীনের আলো। আল্লাহর সত্য বাণী দ্রুত উদ্ভাসিত হতে লাগল। ফলে মিথ্যায় ঢাকা অন্ধকারের চাদর সরে যেতে লাগল। এক নতুন প্রভাতের আগমনী বার্তা যেন শোনা যাচ্ছিল সর্বত্র। সবখানে ধ্বনিত হচ্ছিল ইসলামের জয়গান। মানুষের মুখে মুখে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নাম আলোচিত হচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা) ছিলেন একজন বীর সেনানী। তিনি তখনও ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেননি। মুসলমানদের জানের দুশমন এই খালিদ। ভয়ানক শত্রু বলে মুসলমানরা তাকে চেনে। ইসলামকে ধাবিয়ে রাখতে তিনি কম চেষ্টা করেননি।

তবে সত্যের বিরুদ্ধে তিনি আর পেরে উঠতে পারছিলেন না। সারাক্ষণ তাঁর বিবেক ইসলামের আবেশে নাড়া খাচ্ছিল। মনের দরজায় উঁকিবুকি দিচ্ছিল দীনের আলোর সুষমা। ধীরে ধীরে তিনি সত্যের আবেশে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হলেন। তাই তিনি গভীরভাবে ভাবতেন লাগলেন। এদিকে

www.amarboi.org

ইসলামের বিরুদ্ধেও তিনি খুব পরিচিত নাম। সবাই তাকে লিডার হিসেবে মানে। এটাও যে অনেক বড় মর্যাদা। কিন্তু এটা তো মিথ্যার পথ। মিথ্যাকে আর মেনে নিতে তাঁর বিবেক চাইল না। এদিকে সমাজের পাপ-পঙ্কিলতা তার মনকে বিষিয়ে তুলল। তাই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। না, এভাবে আর চলা যায় না। অসত্যের জীবন আর নয়। খালিদ শেষমেশ নড়ে চড়ে উঠলেন। ইসলামকে কবুল করতে তিনি উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। একসময় মহানবী (সা)-এর সান্নিধ্য পেতে খালিদের মধ্যে পেরেশানি সৃষ্টি হলো।

একদিন তিনি মদীনার পথে পা বাড়ালেন। মদীনা তখন অনেক দূরের পথ। তাতে কী? নবীজির সাথে তাঁকে দেখা করতেই হবে। অবশেষে খালিদ ঠিকই মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং নবীজির সাথে দেখা করলেন। কালবিলম্ব না করে মহানবী (সা)-এর হাতে হাত রেখে খালিদ ইসলাম কবুল করে নিলেন।

হযরত খালিদ (রা) ইসলামে দাখিল হওয়ার আগে নবীজিকে বললেন,

: হে দীনের নবী (সা)! আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি। আমার অনেক অপরাধ হয়েছে। এতদিন ভুল পথে চলে জীবনকে কালিমালিপ্ত করেছি। আমি নিজের ওপরও অনেক জুলুম করেছি। আজ আমি সত্য ও মিথ্যার তফাত বুঝতে পেরেছি। আর না বুঝে ইসলামেরও অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি। মুসলমানের মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আজ আপনি আমাকে মাফ করে দিন। এখনই আমাকে সত্য দীন গ্রহণ করার সুযোগ দিন।

খালিদ এতদিন ছিলেন ইসলামের পরম শত্রু। দীনের আলো নির্বাপণে যার হাত ছিল সক্রিয়, সেই খালিদ এখন ইসলামের মহান সেবকে পরিণত হলেন। তার মতো একজন বীর পুরুষের ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের শক্তি আরও বেড়ে গেল। এদিকে মহাবীর খালিদের জন্য শুরু হলো আরেক ভিন্ন জীবন। এ জীবন সুন্দর ও সৌরভে ভরা, এ জীবন বেহেশতি আলোয় উদ্ভাসিত। দীন কায়েমের দীর্ঘ সংগ্রামে খালিদ (রা) শামিল হলেন। ফলে কাফেররা আঁতকে উঠল। মুশরেকদের হৃদকম্পন শুরু হলো। হযরত খালিদের যে তরবারি ইসলামের ধ্বংসে ব্যবহৃত হতো, তা এখন দীন কায়েমের লড়াইয়ে শতগুণ দৃঢ়তায় গর্জে উঠল। তাঁর ক্ষুরধার তরবারির সামনে দাঁড়াতে কাফেররা আর সাহস পেল না। কাফেররা জানে খালিদের বীরত্ব কতটা ভয়ানক ও সুকঠিন। ইসলামে আসার পর তাঁর তরবারি বহু মুশরেক ও কাফেরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেছে, তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ তছনছ করে দিয়েছে।

www.amarboi.org

দুই, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ (রা) প্রথম মুতার জেহাদে অংশ নিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব সবাইকে অবাক করে দিল। একে একে তিনজন মুসলিম সেনাপতি সেদিন শহীদ হলেন। এতে মুসলিম সেনারা হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারা সবাই ঘাবড়ে গেলেন। চরম পরাজয়ের অন্ধকার সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন হযরত খালিদ। সাহসিকতার সাথে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন। এরপর খালিদের সুনিপুণ নেতৃত্বে মুসলমানরা শত্রু সেনাদের ওপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাঁর যুদ্ধ পরিচালনায় শত্রু শিবিরে নেমে এলো অমানিশা। ফলে শত্রুরা দিকশূন্য হয়ে পড়ল। যুদ্ধ করতে করতে একে একে খালিদের সাতটি তরবারি ভেঙে গেল। তারপরও থামলেন না তিনি। প্রাণপণে লড়াই করে অগণিত শত্রু খতম করলেন খালিদ (রা)। হযরত খালিদ (রা)-এর বুদ্ধি, অপরাজেয় সাহস ও অমিত বীরত্বের কাছে হেরে গেল কাফের মুশরেক দল। মুতায় নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেল মুসলিম বাহিনী।

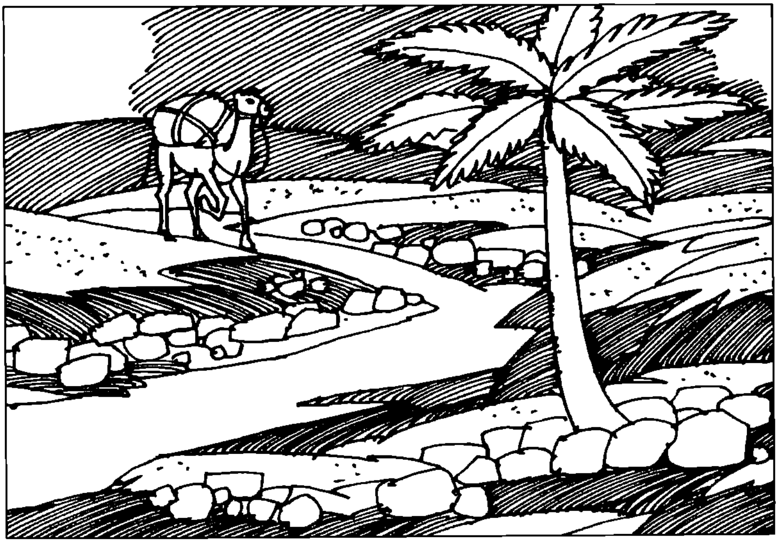

তিন, হুনাইনের জেহাদে হযরত খালিদের বীরত্বও ছিল প্রশংসনীয়। তিনি অসীম সাহসিকতার সাথে হুনাইনে লড়াই করেন। শত্রুদের তীরের আঘাতে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সেই ক্ষত দিয়ে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরে

www.amarboi.org

পড়ল। তবু থেমে যাননি হযরত খালিদ (রা)। হুনাইনের ময়দানে তাঁর তরবারির ধার এতটুকুও কমেনি, বরং তিনি দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে মুসলিম শিবিরে সাহসের দোলা জাগান। এখানেও শত্রুরা পরাজিত হয়।

চার, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কা অভিযানে হযরত খালিদ (রা) ছিলেন সক্রিয়। বিনা প্রতিরোধে মক্কা বিজিত হলেও সেদিন সামান্য রক্ত ঝরেছিল। আবু জেহেলের ছেলে মুসলমানদের অবস্থা বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে সামান্য প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিল। তার লোকেরা হযরত খালিদকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছিল। এর জবাবে খালিদের তীর শত্রুদের দিকে ধাবিত হলো। বিদীর্ণ হলো শত্রুদের বুক। সেখানেই মারা পড়ল কয়েকজন মুশরেক। আর ব্যর্থ হলো তাদের প্রতিরোধ।

পাঁচ, মহানবী (সা)-এর ওফাতের পরের এক ঘটনা। হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ডনবী তুলাইহাকে দমন করার জন্য হযরত খালিদকে দায়িত্ব দিলেন। খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে তুলাইহাকে শায়েস্তা করতে বের হলেন। তুলাইহার বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই হলো। জেহাদে তুলাইহা চরমভাবে পরাজিত হলো। সেদিন আরও অনেকে হযরত খালিদের বাহিনীর কাছে খতম হলো। তুলাইহার ত্রিশজন সেনাকে খালিদের লোকেরা বন্দী করল। তাদের এনে হাজির করা হলো হযরত আবু বকর (রা)-এর সামনে।

ছয়, এরপর হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ডনবী মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করেন। এবারও সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো হযরত খালিদকে। তাঁর বীরত্বে মুসাইলমার বাহিনী চরমভাবে পরাজিত হলো। হযরত ওয়াহিশীর হাতে নিহত হলো মুসাইলামা। এই মুসাইলামাই ছিল নবীজির চাচা হযরত হামজার হন্তা। ভণ্ড নবীদের পরাভূত করে এবার খালিদ (রা) মুরতাদদের নির্মূলে অভিযানে নামলেন। তাদেরও দৃঢ়তার সাথে পরাজিত করলেন তিনি। জাকাত অস্বীকারকারী মুনাফেকরাও হযরত খালিদের তরবারির কাছে পরাজিত হলো। তিনি প্রতিটি জেহাদে অত্যন্ত সফল হলেন। এরপর হযরত খালিদ ইরাকে অনেক লড়াই পরিচালনা করেন। তাতেও খালিদের অতুলনীয় সফলতা আসে। হযরত খালিদ (রা)-এর সাহস ও দৃঢ়চেতা নেতৃত্বে একসময় সমগ্র ইরাক মুসলমানদের করতলগত হলো।

সাত, ফাহলের যুদ্ধে রোমান শত্রুরা হযরত খালিদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করল। তবে তাদের জেহাদ থামল না। রোমানরা এবার

www.amarboi.org

দামেস্ক আক্রমণ করে বসল। প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছিল মুসলিম বাহিনীর সাথে। হযরত খালিদ (রা) অসীম সাহস ও যোগ্যতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। রোমান বাহিনী হযরত খালিদের নেতৃত্বে একসময় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের বহু সেনা সেদিন নিহত হলো, আহত হলো অসংখ্য শত্রুসেনা। অহঙ্কারী রোমান সম্রাট এ পরাজয় মেনে নিতে পারল না। তাই তারা আবারও যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। এবার বিপুল রণসম্ভার ও সৈন্য নিয়ে রোমানরা প্রস্তুতি নিলো। রোমান সেনাপতির নাম মাহান। তিনি দু'লাখ চব্বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়ারমুক ময়দানে সমবেত হলেন।

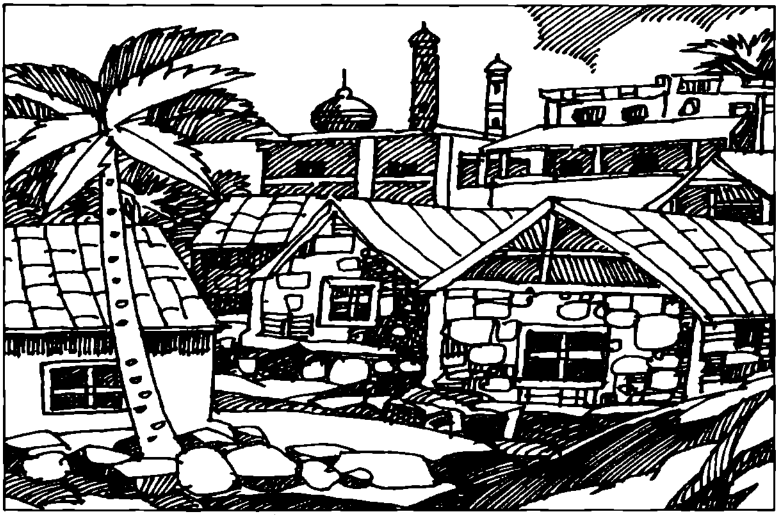

রোমানদের যুদ্ধ যাত্রার খবর পেয়ে হযরত আবু বকর (রা)ও বসে থাকলেন না। তিনি মহাবীর হযরত খালিদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন ইয়ারমুকে। ৫০,০০০ সেনার এক বিশাল মুসলিম বাহিনী। ইয়ারমুকে এসে হযরত খালিদ প্রতিপক্ষ সেনাপতি মাহানের সামনাসামনি হলেন। কিন্তু রোমান সেনাপতি মাহান বুঝতে পারল, এই যুদ্ধে তারা জয়ী হতে পারবে না। তাই চতুর রোমান সেনাপতি মুসলমানদের সাথে সমঝোতার চিন্তা করলেন। হযরত খালিদের সাথে রোমান সেনাপতি মাহান কথা বললেন। মাহান প্রস্তাব করলেন,

www.amarboi.org

: শোন খালিদ! তোমাদের অনেক অভাব। তোমরা অনেক দূর থেকে এসেছ। তোমার সেনারা ক্ষুধার্ত। তাই বলি, আমার আপস প্রস্তাব মেনে নাও। তুমি রাজি হলে তোমাদের প্রত্যেককে দশটি দিনার করে দেব, এক প্রস্থ কাপড় দেব। তোমাদের খাবারও দেব। আগামী বছরও তোমরা এভাবে জিনিসপত্র পাবে। এসব কিছুর জন্য শর্ত হলো, তোমরা যুদ্ধ না করে এখান থেকে চলে যাবে।

মাহানের এ প্রস্তাবে হযরত খালিদ অপমানবোধ করলেন। তিনি রোমান সেনাপতিকে বললেন,

: মাহান! তুমি জান, মুসলমানরা ভিখেরির জাত নয়। তারা আল্লাহর সৈনিক। অর্থের বিনিময়ে তাদের কেনা যায় না। একথা বলেই হযরত খালিদ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর সোজা ছুটলেন তাঁর সেনা ছাউনির দিকে। মুসলিম সেনারা ছিল প্রস্তুত। খালিদ 'আল্লাহু আকবার' বলে জেহাদের ঘোষণা দিলেন। আর অমনি তিনি বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন রোমান বাহিনীর সামনে। মহাবীর খালিদ প্রথমেই ঢুকে পড়লেন রোমান অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর ঠিক মাঝখানে। তারপর তীব্রভাবে চলালেন তরবারি। যারাই সামনে এলো তারাই হযরত খালিদের ক্ষুরধার তরবারির নিচে পড়ে মারা পড়ল।

মুসলিম সেনারা সবাই প্রাণপণে লড়াই করলেন। মুসলমানের বীরত্ব ও হযরত খালিদের সুনিপুণ নেতৃত্ব রোমান বাহিনীকে দিশেহারা করে তুলল। তারা আর টিকে থাকতে পারল না।

পরদিন সকাল বেলা। রোমান বাহিনীর একেবারে তছনছ অবস্থা। তাদের অসংখ্য লাশে ভরে গেছে ইয়ারমুক ময়দান। আহত হয়ে যারা বেঁচে গেছে তারা ছাউনিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে হযরত খালিদকে দেখা গেল তিনি রোমান সেনাপতি মাহানের মঞ্চের ওপর বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছেন। এ কাণ্ড দেখে রোমানরা আঁতকে উঠল। মুসলিম সেনারাও হতবাক হলো। হযরত খালিদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় সবাই চমকে গেল। সেদিন রোমানদের আরেক কমান্ডার ছিলেন জারজাহ। তিনি হযরত খালিদের অসীম সাহস, দৃঢ় নেতৃত্ব ও খোদাভীতি দেখে বিস্মিত হলেন। আর তখনই তিনি ইসলাম কবুল করে নিলেন এবং রোমানদের পক্ষ ছেড়ে মুসলিম ছাউনিতে এসে আশ্রয় নিলেন।

www.amarboi.org

এভাবে হযরত খালিদ (রা) তাঁর দায়িত্ব নিবিড়ভাবে পালন করেছেন। তাঁর সাহস, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও বীরত্ব ইসলামের সুমহান আদর্শকে অনেক ওপরে তুলে ধরেছিল। ইসলামের শক্তি হযরত খালিদের যোগ্য নেতৃত্বে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। হযরত খালিদ (রা) সকল জেহাদে অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ করতে করতে খালিদ (রা) তাঁর জীবনের সবটুকু বিলিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে তাঁর শরীরের প্রতিটি জায়গায় তীর কিংবা বর্শার চিহ্ন দেখা যেত।

ইসলামের ইতিহাসে মহাবীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ এক অনন্য নাম। মহানবী (সা) হযরত খালিদকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ করে বলতেন,

: তোমরা খালিদকে কষ্ট দিও না। কেননা, সে কাফেরদের বিরুদ্ধে চালিত আল্লাহর তরবারি আর তখন থেকেই খালিদের উপাধি হয়েছিল 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি'। এ উপাধি নবী (সা) একজনকেই দিয়েছিলেন। সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী আমাদের প্রিয় বীর হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা)।

www.amarboi.org

হযরত খালিদ (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা) দুঃখ করে বলতেন, 'আমাদের নারীরা খালিদের মতো সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে, সত্যিই হযরত খালিদের মতো এমন মহান বীর ইসলামের ইতিহাসে তেমনটি আর দেখা যায়নি।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত খালিদ কে ছিলেন?
২. ইসলামে দাখিল হবার আগে খালিদ মহানবী (সা)-কে কী বলেছিলেন?
৩. ইয়ারমুক যুদ্ধে রোমান সেনাপতি কে ছিলেন?
৪. ইয়ারমুক জেহাদে রোমান ও মুসলিম সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
৫. রোমান সেনাপতি হযরত খালিদকে কী প্রস্তাব দিলেন?
৬. কোন রোমান কমান্ডার কেন এবং কিভাবে ইসলাম কবুল করলেন?
৭. মহানবী (সা) হযরত খালিদকে কী উপাধিতে ভূষিত করেন?

www.amarboi.org

মজবুত ঈমানের সুরভিত গোলাপ

আবু জেহেল। ইতিহাসের পাতায় একটি অভিশপ্ত নাম। আবু জেহেলের মন ছিল কপটতায় ভরা, জীবন ছিল পাপ ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। তাই সততা ও ন্যায়নীতি ছিল তার কল্পনার বাইরে। বিপদগামীদের সর্দার ছিল আবু জেহেল। সত্যকে পছন্দ করা তো দূরের কথা, সত্যের নামও সে শুনতে পারত না।

সে সময় আরবের সমাজ ভালো ছিল না। গোটা সমাজ অন্যায়, পাপাচার, অনাচার ও অবিচারে পরিপূর্ণ ছিল। মানুষ এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অনেক প্রভুর ইবাদাত করত। আরবে তখন হানাহানি ও দলাদলি লেগেই থাকত। প্রাচীন আরবের লোকেরা মেয়েদের জীবন্ত কবর দিত। এভাবে এক ঘোর অন্ধকারে ডুবে ছিল আরব সমাজ।

একসময় দুনিয়ায় এলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ তাঁকে নবী করে পাঠালেন। মহানবী (সা)-এর কাজ ছিল মানুষকে কল্যাণের পথ দেখানো। তাঁর সাথে ছিল সত্যের আলো। এ আলোর নাম ইসলাম।

www.amarboi.org

মানুষকে অসত্য ও অন্যায়ের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য এটা ছিল একমাত্র পথ। কিন্তু আবু জেহেলের কাছে এটা পছন্দ হলো না। সে ছিল অন্ধকার পথের মানুষ। বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়া সে কিছুই বুঝতে চাইত না। তাই সে ইসলামের বিরোধিতা করল। এ জন্য নবী (সা)-কেও সে অনেক কষ্ট দিল। শুধু তাই নয়, যারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম মেনে নিত তাদের ওপরও চালাত নির্যাতন। মাঝে মাঝে চাবুক মেরে তাদের চামড়া তুলে নিত। আবু জেহেলের সাঙ্গো-পাঙ্গরা ছিল একই প্রকৃতির। মুসলমান দেখলেই তাদের গা জ্বলে উঠত।

আবু জেহেলের পুত্রের নাম ইকরামা। পুরো নাম ইকরামা বিন আবু জেহেল। পিতার মতো ইকরামাও ভালো লোক ছিল না। সে ছিল আল্লাহর দীনের ঘোর শত্রু। বাবার পঙ্কিল চরিত্র ইকরামাকে পেয়ে বসেছিল। তাই সে ইসলামকে ভালো চোখে দেখত না। ইসলামের প্রতি তার ছিল সীমাহীন বিদ্বেষ। মুসলমানদের সাথেও সে ভালো ব্যবহার করত না। সুযোগ পেলেই সে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালাত। ইসলামের আলো তার অন্ধকার মনকে নাড়া দিতে পারল না, বরং ইসলামের প্রসার দেখে তার বৈরী মনোভাব আরও প্রকট হয়ে উঠল।

তবে আবু জেহেল ও ইকরামাদের দাপট বেশি দিন টিকল না। ধীরে ধীরে ইসলামের আলো মক্কার জনপদে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে মুসলমানদের দল ভারী হয়ে উঠল। একসময় মুসলমানদের জীবনে দেখা দিল সোনালী সুদিন। আরবের মরুতে ফুটতে শুরু করল ঈমানের সুরভিত গোলাপ। আর তার সুরভি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

এরি মধ্যে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের শক্তির লড়াই শুরু হলো। আর এর ফলে ঘটে গেল বদর যুদ্ধ, ইসলামের প্রথম জেহাদ। সেটা ৬২৪ সালের কথা। মদীনা থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তর। সেখানে সুসজ্জিত কাফেরদের সাথে মুসলমানদের তুমুল লড়াই হলো। শত্রুরা ছিল অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকবলে বহুগুণে শক্তিশালী। কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। অন্যদিকে মুসলমানদের অস্ত্র ছিল নামমাত্র। তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক কম, তিনশ' তেরজন মাত্র। মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলে কী হবে, আল্লাহর কৃপায় তারা যুদ্ধে জয়ী হলো, কাফেরদের ঘটল চরম পরাজয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আবু জেহেল বদর প্রান্তরে

www.amarboi.org

নিহত হলো। পুত্র ইকরামাও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তবে ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেল।

তারপর কেটে গেল অনেক বছর। এর মধ্যে শত্রুদের সাথে মুসলমানদের আরও অনেক লড়াই হলো। কিন্তু কাফেররা বারবার পরাজিত হলো। ফলে মদীনায় ইসলামের সুষমা আরও বিস্তৃত হলো। মহানবী (সা) এবার মাতৃভূমি মক্কায় ফিরে আসতে চাইলেন। কারণ, জন্মভূমিতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। মক্কা বিজয়ের স্বপ্ন দেখলেন মহানবী (সা)।

ঐতিহাসিক অষ্টম হিজরি সালের ঘটনা। দশই রমজানের এক আলো ঝলমল দিন। মাত্র দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মহানবী (সা) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করলেন। প্রায় বিনা বাধায় তিনি মক্কা নগরী জয় করলেন। মক্কার আকাশে উড়ল ইসলামের বিজয় কেতন। তাই মক্কার বড় বড় শত্রুরা হতবাক হয়ে গেল। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মক্কা শত্রুদের হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। এখন উপায়! তারা যে মুসলমানদের পরম শত্রু। অথচ আজ তাদের জন্মভূমি মুসলমানদের দখলে! তাই প্রচণ্ড মৃত্যুভয় তাদের তাড়া করল। কাফেররা ভাবল, আজ আর রক্ষা নেই। মুহাম্মদের লোকেরা তাদের ছাড়বে না। হাতের নাগালে

www.amarboi.org

গেলেই তারা মারা পড়বে। তাই তারা চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। জান বাঁচাতে যে যার মতো পালাতে শুরু করল।

কিন্তু তাদের এ ধারণা অল্পক্ষণ পরেই ভুল বলে প্রমাণিত হলো। শত্রুরা মহানবী (সা)-এর চরিত্রমাধুর্য ভালো করে জানত না। তিনি যে ক্ষমার নবী, তাঁর মন যে পবিত্র ও সুন্দর তা তারা অনুমানও করতে পারল না। তবু তাদের অনেকে মনে সাহস জুগিয়ে মহানবী (সা)-এর কাছে এলো, নিজেদের অপরাধের জন্য করজোড়ে ক্ষমা চাইল। নবী মুহাম্মদ (সা) সাথে সাথেই তাদের ক্ষমা করে দিলেন। ইসলামের অনেক বড় দুশমনও সেদিন ক্ষমা পেয়ে গেল। মহানবী (সা)-এর এ ক্ষমা ও উদারতার মহিমা বিদ্যুৎ গতিতে মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। তাই মানুষ দলে দলে মহানবী (সা)-এর কাছে ছুটে এলো। তারা নবীজির ভালো ব্যবহার ও উদার মন দেখে অবাক হলো। তাদের ভুল ভেঙে গেল। তাই কাফের মুশরেকরা ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের পবিত্র করে নিল। দেখতে দেখতে ইসলামের পতাকার নিচে এসে জড়ো হলো হাজারো মানুষ।

এ অবস্থা দেখে আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝতে পারল তার আজ আর রক্ষা নেই। সে যে বড় অপরাধী। তার সীমাহীন অপরাধ যে ক্ষমার অযোগ্য, তা সে ঠিকই অনুধাবন করতে পারল। তাই ইকরামা পালাবার পথ খুঁজল। মক্কার অদূরেই জেদ্দার উপকূল। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলল ইকরামা। লোহিত সাগরের পানিতে ভেসে চলছে তার নৌকা। কিন্তু ইকরামার বদনসিব। সাগরের ভয়ঙ্কর ঊর্মিমালা আর প্রবল ঝড় তার যাত্রাপথ আগলে ধরল। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ইকরামার নৌকার ওপর আছড়ে পড়ছিল। ঢেউয়ের আছাড় খেয়ে ইকরামার নৌকা সাগরের অথৈ পানিতে তলিয়ে যাবার উপক্রম হলো। ইকরামা দেখতে পেল পাহাড়সম ঢেউ এসে তাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। ওদিকে পেছনে আবার মুহাম্মদ (সা)-এর লোকেরা তাকে মৃত্যুর হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এমন সময় ঘটে গেল এক অভিনব ঘটনা। ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকিম স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে তীরে এসে উপস্থিত হলো। অনেকক্ষণ ধরে সে স্বামীর দুরবস্থা দূর থেকে অবলোকন করছিল। তাই স্বামীকে সাহায্য করতে সে দৌড়ে এলো। উম্মে হাকিম চিৎকার করে বলল,

www.amarboi.org

: ওগো! শোন, তাড়াতাড়ি তীরে উঠে এসো। তোমার জন্য ভালো খবর নিয়ে এসেছি। তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি তীরে চলে এসো।

'ভয় নেই?'– শব্দটি ইকরামার কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করতেই সে চমকে উঠল। প্রচণ্ড ঝড় ও সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউয়ের আচরণে সে স্থির থাকতে পারছিল না। আবার স্ত্রী মুখে অভয় বাণী শুনে তাও সে অগ্রাহ্য করতে পারল না। তাই ইকরামা তীরে এসে পা রাখল। তখনও ভয়ে ইকরামার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। উম্মে হাকিম তাকে শান্ত হতে বলল। সে জানাল,

: আমি রাসূলের কাছ থেকে তোমার নিরাপত্তার আশ্বাস নিয়ে এসেছি। তিনি তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। তোমার আর কোনো ভয় নেই। তাই চলো, নবীজির কাছে চলো।

স্ত্রীর কথা ইকরামা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার মন বলছিল, তার মতো এত বড় অপরাধীকে কেউ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ করে তা হলে তার মন অবশ্যই অনেক বড়। সে অবশ্যই মহামানব ছাড়া আর কেউ নয়। আল্লাহর নবী (সা) সম্পর্কে ইকরামার যে খারাপ ধারণা ছিল স্ত্রীর কথায় তা খানিকটা কেটে গেল। তারপরও ইকরামা মুহাম্মদ (সা)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো সাহস করতে পারল না।

www.amarboi.org

ইকরামার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তখনও কাটছিল না। এদিকে মহানবী (সা)-এর সাথে খারাপ ব্যবহারের জন্য তার মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনা কাজ করছিল। এভাবে ভয়, দ্বিধা ও লাজুকতা নিয়েই ইকরামা একসময় এগিয়ে চলল। সে যাচ্ছে আল্লাহর নবীর সাথে দেখা করতে। খানিকক্ষণ পরই ইকরামা মহানবী (সা)-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছাল।

একটু দূরে থাকতেই ইকরামা মুহাম্মদ (সা)-এর চোখে পড়ে গেল। তার চোখও গিয়ে পড়ল মহানবী (সা)-এর চোখের ওপর। ইকরামা এবার লাজে ও ভয়ে আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে পড়ল।

আল্লাহর নবী তো মহামানব। বড় মনের মানুষ। তাই তিনি নিজে এগিয়ে এসে ইকরামাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নবীজির এই অপূর্ব ব্যবহারে ইকরামা সীমাহীন বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেল । মহানবী (সা)-এর এ আচরণ যে তার কল্পনারও বাইরে। তাই দুনিয়ার সব বিস্ময় এসে তাকে যেন নির্বাক করে দিল। তার গোটা দেহমনে তৃপ্তির এক অভিনব শিহরণ খেলে গেল। কৃতজ্ঞতার আতিশয্য ইকরামার জীবনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। ইকরামা যেন আর কিছুই ভাবতে পারছে না। মহানবী (সা)-এর চরিত্রমাধুর্যে সে এখন সীমাহীন মুগ্ধ। তাই তার শির অনায়াসে মহানবী (সা)-এর সামনে নত হয়ে এলো। ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। কিছুক্ষণ পর ইকরামার বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সে কী করবে না করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এবার ইকরামা ধীরে ধীরে মহানবী (সা)-এর মুখের দিকে সহানুভূতি পাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাল। তাঁর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল। সে বলল,

: হে আল্লাহর নবী! আমি না বুঝে গুরুতর অপরাধ করেছি। আপনার সাথে অনেক অন্যায় আচরণ করেছি। আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমি অমানুষের মতো কাজ করেছি। আমি আপনাকে অনেকবার কষ্ট দিয়েছি। আজ আমি ক্ষমা চাই। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আর আমাকে মুসলমান করে নিন।

মহানবী (সা) যে ইকরামাকে আগেই মাফ করে দিয়েছেন। তবে তার কাতর অনুরোধ এবং অনুতাপ দেখে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। নতুন এক ইকরামাকে পেয়ে মহানবী (সা)-এর মন ভরে গেল। এ জন্য তিনি আল্লাহকে শোকরিয়া জানালেন। আর দু'হাত তুলে মহান স্রষ্টার কাছে

www.amarboi.org

ইকরামার হেদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। মহানবী (সা)-এর এই মুনাজাত দেখে ইকরামা আরেকবার অবাক হলো। তার মনের ভেতর যেন ইসলামের আলো নড়ে উঠল। ফলে ইকরামার দুচোখ বেয়ে নেমে এলো আনন্দের অশ্রুধারা।

খানিকক্ষণ ধরে আর কোনো কথাই বলতে পারল না ইকরামা। এরি মধ্যেই তার মনে খেলে গেল অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, নিজেকে এবার ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেবেন। তাই তিনি নবীজিকে বললেন,

: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দীনের পথে কাজ করতে চাই। আমি এতদিন হক ও সত্যের যতটা বিরোধিতা করেছি, ইসলামের জন্য তার দ্বিগুণ কাজ করব। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।

মহানবী (সা) ইকরামার জন্য আবারও প্রাণভরে দোয়া করলেন। এর মধ্যেই অনেকক্ষণ সময় গড়িয়ে গেল। এবার ইকরামা ঘরে ফিরে যাবার জন্য মনস্থ করলেন। কিন্তু প্রাণের নবীকে ছেড়ে যেতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। ইকরামার বুক যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল, মন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ফলে তার দু'চোখ বেয়ে আবারও নামল অশ্রুধারা। এ অশ্রু মুছতে মুছতেই ইকরামা একসময় মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর থেকে ইকরামা আর বসে থাকেননি। ইসলামের খেদমতে তিনি সবসময় ব্যস্ত থেকেছেন। ঈমানের যে গোলাপ মহানবী (সা) তার মনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার সুরভি মেখে তিনি কাটিয়ে দিলেন বাকিটা জীবন।

ব ল তে পা রো ?

১. ইকরামা কে ছিলেন? তিনি কেমন লোক ছিলেন?
২. মক্কা কখন বিজিত হয়? এ অভিযানে মহানবী (সা)-এর সাথে কতজন সাহাবী ছিলেন?
৩. ইকরামা কিসের ভয় পাচ্ছিলেন? তার স্ত্রী কী খবর নিয়ে এলো?
৪. ইকরামা ইসলামের কাজ করার জন্য মহানবী (সা)-কে কী বলেছিলেন?

www.amarboi.org

ধনীর দুলাল ওজ্জা হলেন নিঃস্ব

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের কথা। আরবে তখন ধনী গরিব সব ধরনের লোকই বাস করত। সে সময়ের এক ধনী লোকের কাহিনী বলি। শোন তা হলে।

লোকটির নাম ছিল ওজ্জা। তবে ইসলাম কবুল করে তার নাম হয়ে গেল আবদুল্লাহ (রা)। মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন তিনি। ওজ্জা ছিলেন পিতা-মাতার অতি আদরের সন্তান। তাঁর পরিবারের ছিল অঢেল সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব। তাদের কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ফলে ওজ্জার শৈশব ও কৈশোর বেশ আরাম-আয়াসের মধ্যেই কেটেছিল। বয়স হলে মা-বাবা তাঁকে বিয়ে করান। এক ধনীর দুলালীর সাথে ওজ্জার বিয়ে হলো।

আরবে সময়টা তখন খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। মানুষ তার প্রভুকে ভুলে গিয়ে মূর্তির পূজা করত। নানা রকম কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল আরবের মানুষ। আরবের অধিকাংশ মানুষ ছিল পৌত্তলিক। আরব সমাজের মানুষের স্বভাব-চরিত্রও তেমন ভালো ছিল না। তারা মারামারি হানাহানি নিয়ে মেতে থাকত। এমন এক কঠিন সময়ে আরবে আল্লাহতাআলা তাঁর পেয়ারা নবী

www.amarboi.org

হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠালেন। তিনি মানুষকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে ডাকছিলেন। পুরোদমে তখন চলছে দীনের কাজ, ইসলাম প্রচারের দাওয়াত। মহানবী (সা)-এর দাওয়াত অনেকেই কবুল করে নিচ্ছিল। বহু খোদার গোলামি ছেড়ে মানুষ এক আল্লাহকে মেনে চলতে আগ্রহী হলো। ধীরে ধীরে এ দাওয়াত মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ল। ওজ্জার কাছেও গিয়ে পৌঁছল ইসলামের বাণী। ইসলামের সৌন্দর্য ওজ্জাকে আকৃষ্ট করল। রাসূল (সা)-এর মুখে এক আল্লাহর কথা ওজ্জার মনকে নাড়া দিল। তাই তিনি ইসলাম কবুল করে মুসলমান হলেন।

তবে তাঁর ইসলাম কবুলের বিষয়টি সহজ ছিল না। সেই সময়ে ওজ্জার বাবা জীবিত ছিলেন না। মা আর পিতৃব্য ছিলেন তাঁর অভিভাবক। ইসলাম গ্রহণ করে ওজ্জা তাঁর পিতৃব্যকে এ খবর জানালেন। তিনি একথাও বললেন,

: চাচা! আমি তোমাকে এক মহাসত্যের খবর দিচ্ছি। তোমাকে আল্লাহর কথা বলছি। তিনিই আমাদের স্রষ্টা এবং আসল প্রভু। আর আবদুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। তিনি সত্য নবী। আমি তাঁর কথা মেনে নিয়েছি। তুমিও তাঁর কথা মেনে নাও। ইসলাম কবুল করে মুসলমান হও।

ওজ্জার পিতৃব্য ইসলামকে বিশ্বাস করত না। এটা তার কাছে ছিল অসহ্য। সে আল্লাহর নবীকে ঘৃণার চোখে দেখত। তাঁর কথাবার্তাকে সে অমূলক বলে উড়িয়ে দিত। তাই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় পিতৃব্য অবাক হলো। তার মুখে মুহাম্মদের কথা শুনে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। প্রচণ্ড রাগে পিতৃব্য ছটফট করতে লাগল। পারে না ওজ্জাকে মেরে ফেলবে। চাচার এ অবস্থা দেখে ওজ্জা ভয় পেয়ে গেলেন।

পিতৃব্য এবার হুঙ্কার ছেড়ে বলল,

: দেখ ওজ্জা! তুই এতিম। তোকে আমি আমার নিজের সন্তানের মতো দেখি। তোকে আমি অতিশয় পছন্দ করি। বলি শোন, তুই আমার অবাধ্য হবি না । আমাদের ধর্ম ছেড়ে তুই মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারিস না। এ ধর্ম সত্য নয়। এ নতুন ধর্ম তোকে ত্যাগ করতে হবে। নইলে তোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ওজ্জা চাচার কথা অবাক হয়ে শুনলেন। তবে তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। এতে চাচা আরও ক্ষিপ্ত হলো। সে আবারও বলতে লাগল, 'শোন ওজ্জা! তুই বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে নাস্তিক হয়ে গেছিস। তুই যদি নতুন ধর্ম না ছাড়িস, তা হলে আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও তোকে দেব না।

www.amarboi.org

ওজ্জা চাচার শেষ কথা শুনে ঠিকই চমকে উঠলেন। ক্ষণিকের জন্য তিনি ভয়ও পেলেন। তবে তাঁর এই ভয় নিমিষেই কেটে গেল। তিনি মনকে শক্ত করলেন। তারপর অতি দৃঢ়তার সাথে চাচাকে উদ্দেশ করে বললেন,

: দেখুন চাচা! আমি সত্যকে খুঁজে পেয়েছি। এটাই আমার কাছে বড় সম্পদ। আপনার সম্পত্তির প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনি আমার চাচা বটে। আপনি আমার গুরুজন। তবে বলি চাচা, আমি যে সম্পদ পেয়েছি তা আমার কাছে সবচেয়ে বড়। ইসলামই আমার বড় সম্পদ। তাই আপনার সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

পিতৃব্যের মুখের ওপর সত্যকে সাহসের সাথে উচ্চারণ করেই ওজ্জা ক্ষান্ত হলেন না। তিনি সাথে সাথে তাঁর গায়ের দামি পোশাক খুলে ফেলে দিলেন। এসব কিছু তাঁর কাছে অসত্য ও অসহ্য বলে মনে হলো। এবার তিনি বিধবা মায়ের কাছে ছুটে গেলেন। মাকে বললেন,

: শোন মা! আমি ইসলাম কবুল করেছি। এটাই আমার জীবন। আমি তোমাদের এসব ঐশ্বর্য ও আরাম-আয়েস চাই না। তোমাদের সম্পদেও আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি সবকিছু ত্যাগ করলাম। আমার গায়ের দামি পোশাকও ছেড়ে দিলাম। পার যদি গায়ে দেয়ার মতো আমাকে সামান্য এক টুকরো কাপড় দাও।

শত হলেও তো মা। মা ওজ্জার ধর্মকে পছন্দ না করলেও বুকের ধন ছেলেকে ফেলতে পারেন না। তাই ওজ্জার অবস্থা দেখে মা মনে কষ্ট পেলেন। হাতের কাছে মা ভালো কোনো পোশাক পেলেন না। পিতার আমলের একটা জীর্ণ কম্বল ছিল সেখানে। মা সেটাই পুত্রের হাতে তুলে দিল। ওজ্জা আর কী করবেন! ছেঁড়া কম্বল নিয়ে এটাকে দুই টুকরো করলেন। একখণ্ড গায়ে জড়িয়ে নিলেন আর একখণ্ড পরিধান করলেন। এরপর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে ছুটে চললেন তিনি। নবী (সা) তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তাই অনেক কষ্ট স্বীকার করে ওজ্জাকে দীর্ঘপথ চলতে হলো। অবশেষে ওজ্জা একসময় মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। ওজ্জা খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন মহানবী (সা) মসজিদে আছেন। তাই তিনি নবী (সা)-এর অপেক্ষায় মসজিদের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর তাঁর। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আবদুল ওজ্জা। হঠাৎ তিনি মহানবী (সা)-এর চোখে পড়ে গেলেন। ওজ্জার মনের অবস্থা বুঝতে আল্লাহর নবীর

www.amarboi.org

অসুবিধা হলো না। তিনি ওজ্জাকে কাছে ডেকে আনলেন। তারপর কথার ছলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওজ্জা না ?

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন নবীজি, আমি ওজ্জা। আপনার দীনের সেবক।

মহানবী (সা) বললেন : তুমি ওজ্জা ছিলে। তবে আজ থেকে তুমি আর ওজ্জা নও। তুমি আল্লাহর দাস আবদুল্লাহ। তোমার আর কোনো ভয় নেই। যাও, তুমি আসহাবে সুফফার লোকদের সাথে গিয়ে মিলিত হও। তাদের জামাতে শামিল হও। আর আমার নিকট এ মসজিদেই তুমি থাকবে।

মহানবী (সা)-এর কথা শুনে ওজ্জা যারপরনাই খুশি হলেন। তাঁর সব দুঃখ-ব্যাথা যেন নিমিষেই দূর হয়ে গেল। সে যে আজ গর্বিত। যে সত্যের সন্ধানে সে সবকিছু ছেড়েছে সেই সত্যের মানুষকে এখন সে কাছে পেয়েছে। তাই তাঁর আনন্দ আর কে দেখে! ওজ্জার চোখেমুখে সত্যের আলো যেন ঝলমল করে উঠল। তাঁর বুক ভরে গেল সুখের সীমাহীন আবেশে। আর সেই খুশির ঝিলিক যেন ছড়িয়ে পড়ল মদীনার আকাশে বাতাসে।

ব ল তে পা রো ?

১. ওজ্জা কে ছিলেন? তাঁর পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল?

২. ইসলাম গ্রহণ করে ওজ্জা চাচাকে কী বললেন?

৩. চাচা ওজ্জাকে কী বলে হুঁশিয়ার করেছিল?

৪. অবশেষে ওজ্জা কী করলেন?

www.amarboi.org

সাহাবীদের গল্প শোন

শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, উলন রোড, ঢাকা

ISBN 984-8394-12-5